First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 1

পৃষ্ঠা ১৫

দৈনিক কাল্পনিক

পৃষ্ঠা ০৮

০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, শুক্রবার বর্ষ ০১ সংখ্যা ০৬

দিল্লীতে লোকসভা ভবনের সামনে ফেলানীর ভাস্কর্য

টানা ১০ বছর আন্দোলনের পরে অবশেষে ভারতীয় সরকার ফেলানী খাতুনের মূর্তি তৈরী করতে রাজি হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুড়িগ্রামের অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্তের খিতাবেরকুঠি এলাকায় ০৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যরা ফেলানী খাতুনকে গুলি করে হত্যা করে। বিএসএফ ১৮১ ব্যাটালিয়নের চৌধুরীহাট ক্যাম্পের জওয়ানদের এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। ফেলানীর লাশ পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে ছিল। বিএসএফ নিজস্ব আদালতে এ ঘটনার জন্য দায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বাবার সঙ্গে ফেলানী নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ করত। বিয়ের উদ্দেশ্যে সে দেশে ফিরছিল।

এর পর পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ১

ফিলিস্তিন জাতিসংঘের ১৯৪-তম সদস্য দেশ

ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইন সরকারিভাবে অবশেষে জাতিসংঘে স্বীকৃতি পেল। ১৯৭৪ আরব লীগ শীর্ষ বৈঠকে স্থির হয়েছিল, পিএলও

ফিলিস্তিনের জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছিল আরব লীগ। ২২ নভেম্বর ১৯৭৪ থেকে পিএলও কে "রাষ্ট্রহীন-সত্তা রুপে পর্যবেক্ষক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। তারা কেবলমাত্র জাতিসংঘে তাদের বক্তব্য রাখতে পারতেন, কিন্তু ভোট দেবার কোনো ক্ষমতা ছিল না।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বে ১০,৪২৯ বর্গমাইলব্যাপী ফিলিস্তিন দেশটি ছিল অটোমান খেলাফতের অধীন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যারা ছিল বৃটেন বিরোধী জোটে। তখন যুদ্ধ জয়ে ফিলিস্তিনদের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় ১৯১৭ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর যুদ্ধে জয়ী হলে এই ভূমিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে বলে আশ্বাস দেন। যা ইতিহাসে বেলফোর ঘোষণা হিসেবে পরিচিত। যেহেতু আরবরা ছিল ইহুদিদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি, সেহেতু ঘোষণাটি তাদের অনুকূল বলেই তারা ধরে নেয়। কিন্তু এর মাঝে যে মহা ধোকাটি লুকিয়ে ছিল তা তারা বুঝতে পারেনি।

এর পর পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ৪

হ্যানসেন হাশিম ক্লার্ক কি ইউএস প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে?

আগামী মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবার জন্য আরেক ধাপ আগালেন হ্যানসেন হাশিম ক্লার্ক। আইওয়া পলে ৬০% ভোট পেয়ে তিনি এখন প্রথম সারির ৩ মনোনয়ন প্রাপ্তদের একজন। তবে আইওয়া ফলাফলের পর বহুবার মার্কিন নির্বাচনে হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস আছে। গত ৪০ বছরে এই পলে জেতার পরে শেষ মুহূর্তে নমিনেশান না পাওয়া প্রার্থীর তালিকায় আছে হাওারদ ডীন ও হিলারি ক্লিনটন।

হ্যানসেন হাশিম ক্লার্ক-এর বিখ্যাত উক্তি ছিল 'আমি একজন অনিবন্ধিত অভিবাসীর সন্তান। আর এটা বলতে আমি গর্বই বোধ করি।' বর্তমান সময়ে সেই উক্তিটি তার নির্বাচন প্রচেষ্টার স্লোগান এ পরিণত হয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেসে হ্যানসেন হাশিম ক্লার্ক প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সদস্য। বাবা মোজাফফর আলী হাশিম বাংলাদেশি। সিলেট থেকে মোজাফফর হাশিম যখন আমেরিকায় আসেন, তখন ছিল অখন্ড ভারত। সেটা ১৯৩০ সাল। যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হতে তখন দরকার পরতো মাত্র ২০ ডলার ফি আর উন্নত চরিত্র বা 'গুড মরাল ক্যারেকটার'।

কংগ্রেসম্যান হ্যানসেনের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২ মার্চ। হ্যানসেনের বাবা মারা যান ১৯৬৫ সালে। হ্যানসেনের বয়স তখন আট। মা থেলমা ক্লার্ক ছিলেন আফ্রিকান-আমেরিকান। অল্প বয়সে বাবা মারা গেলে মা পুরোপুরি আগলে রেখেছিলেন ছেলেকে। ম্যাসাচুসেটসের বোর্ডিং স্কুল গভর্নর ডামার একাডেমীতে থেকে হাই স্কুল শেষ করার পর হ্যানসেন ভর্তি হন নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময়ই রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কর্নেল

এর পর পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ৩

এসএসসি মেধা তালিকায় ১ম স্থানে আদিবাসী ছাত্র

গত বছর বাংলার পাশাপাশি চাকমা ভাষায় পরিক্ষা দেবার নিয়ম করার পর এবার ১ম দুই স্থানে চাকমা ছাত্র এসেছে। মেধা চাকমা ও সমারি চাকমা এই ফলাফল পেয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে পাহাড়ি কল্যাণ ফেডারেশান বলেছে যে শুধু মাত্র চাকমা ভাষা যুক্ত হওয়াতে পাহারের অন্য জনগোষ্ঠী বাদ পরে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও ১০টি আঞ্চলিক ভাষা যুক্ত করার প্রস্তাব খুঁটিয়ে দেখছে। তবে ধারনা করা হচ্ছে যে এই ভাষা গুলোকে যুক্ত করতে প্রচুর খরচ পরবে। ওদিকে জাতিসঙ্ঘ এই ব্যাপারে সাহায্য করতে অর্থায়নের ব্যাপারে আলোচনা করছে।

চাকমা ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ ও নিকটস্থ ভারতীয় এলাকায় প্রচলিত একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। চাকমা জাতির লোকেরা মূলত প্রাচীন মগধ রাজ্যের সাক্য গোত্রের লোক। তাদের

এর পর পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ১

ব্রাসেলসে ১৯৫ পাকিস্তানী অফিসারের বিচার শুরু

ব্রাসেলসে "১৯৭১ যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল"-এর কাজ প্রায় নয় মাস ধরে চলছে ।প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে এবার ১৯৫ জন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী অফিসারদের পক্ষ থেকে জবানবন্দী নেওয়া হবে (জীবিত না থাকলে প্রতিনিধীর থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে)। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করে বিচারকমন্ডলী বাছাই করা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে দুই দেশের আইন বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দিতে পারবেন, তবে তারা বিচারকমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এছাড়া মৃত্যুদন্ড দাবী না করে বরং "রিকন্সিলিয়েশান" এর উপর জোড় দেওয়া হবে। তবে এই পদ্ধতির ব্যাপারে বিতর্ক রয়ে গেছে।

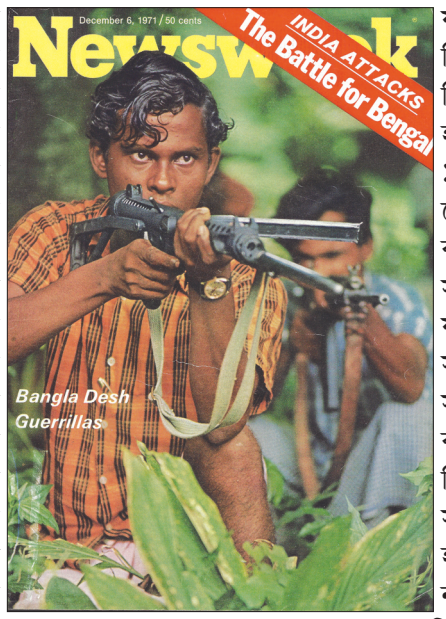

যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোন যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বেসরকারী জনগনের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকান্ডসমূহ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে যুদ্ধ কালিন সংঘাতের সময় বেসরকারী জনগনকে খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, কারাগারে অন্তরীন ব্যক্তিকে হত্যা, নগর, বন্দর, হাসপাতাল কোন ধরনের সামরিক উস্কানি ছাড়াই ধ্বংস প্রভৃতি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশন সর্বপ্রথম যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আইন সমূহ লিপিবদ্ধ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংগঠিত হওয়া নূরেমবার্গের হত্যাকান্ড ও অপরাধ বিচার সবচেয়ে আলোচিত যুদ্ধাপরাধ বিচার। আধুনিক যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৯৪৫ সালের লন্ডন ঘোষনাকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালানো হয়। ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনার

এর পর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 2

ফেইসবুক প্রযুক্তি এখন ড্রোনে ব্যাবহার

ফেইসবুক নিয়ে কেলেঙ্কারির বুঝি শেষ নাই। ইতিমধ্যেই গত ২ বছরে বিভিন্ন অঘটনের কারনে প্রায় ২ কোটি মানুষ তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। এবার নিউ ইয়র্ক টাইমসের বরাতে জানা গেছে যে গত এক বছর যাবত ফেইসবুকের উচ্চ পর্যায়ের অনুমতি নিয়ে একটি বিশেষ দল সার্ভিসটির মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যুদ্ধ ড্রোনের কাজে ব্যাবহার করছে। এই খবর বের হবার পরে এডওয়ার্ড স্নোডেণ, জুলিয়ান আসাঞ্জ, শন পেন সহ অনেকে সবাইকে ফেইসবুক ব্যাবহার বন্ধ করতে আহবান জানিয়েছে।

মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান যা যুদ্ধ ড্রোন বা ড্রোন হিসেবে পরিচিত এক ধরনের মনুষ্যবিহীন আকাশযান। মনুষ্যবিহীন ড্রোন যুদ্ধবিমানগুলোতে সংবেদনশীল যন্ত্র ও ক্যামেরা থাকে। ওই ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ভিডিওচিত্র ভূমি থেকে বিমান নিয়ন্ত্রণকারী অপারেটরের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। আকাশসীমায় গুপ্তচরবৃত্তি চালানো, নিজ দেশের আকাশসীমা পাহারা দেয়া, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, শত্রুদের বেতার ও রাডার সিস্টেমে ব্যাঘাত ঘটানো, আড়ি পেতে তথ্য জোগাড় করা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিমান। এসব বিমান পাইলটবিহীন হওয়ায় যুদ্ধে পাইলটের মৃত্যুঝুঁকি থাকে না তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিমান ব্যবহার করা যায়।

ফেইসবুকের আভ্যন্তরীণ ফাইল ঘেঁটে জানা গেছে যে তারা সেলেঙ গ্যালিলো ফ্যালকো নিয়ে কাজ করছে। এটি মূলত গোয়েন্দা নজরদারির জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছে। অত্যাধুনিক ইনফ্রারেড ক্যামেরা এবং সেন্সরসংবলিত এই ড্রোনটি অপেক্ষাকৃত মাঝারি উচ্চতায় আকাশে ভেসে থাকতে সক্ষম। এটি সাধারণত কোনো অস্ত্র বা মিসাইল ব্যবহার করে না তবে এর পরবর্তী আপগ্রেড ভার্সনগুলোতে কমব্যাট উইপন সংযোজন করা হবে। এটি ১৭ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট চওড়া একটি বিমান যা অপেক্ষাকৃত মাঝারি উচ্চতায় আকাশ থেকে নজরদারি চালাতে পারে। সিঙ্গেল ইঞ্জিনে পরিচালিত ড্রোনটি ঘণ্টায় ২১৬ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। এর সার্ভিস সিলিং রেট ২১,৩২৫ ফুট। গোপন সূত্রে জানা গেছে যে ফেইসবুক তার সার্ভিসের মাধ্যমে যে তথ্য পায়, সেটা এই ফ্যালকো 'র চালকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তারা ড্রোনটিকে বিশেষ টার্গেট এলাকায় পাঠাতে পারে।

পাকিস্তনের প্রেসিডেন্ট ইমরান খান গত বৃহস্পতিবার বলেন, ফ্যালকো যদি পাকিস্তানি সেনারা ব্যবহার করে তা হলে তা পাকিস্তানের জনগণের কাছে সমালোচিত হবে না। তিনি দাবী করেন যে পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি ফেইসবুকের ব্যাবহারকারী আছে-- সুতরাং এই ফেইসবুক-ড্রোন প্রযুক্তি অবশ্যই ইসলামাবাদের কাছে আসা

দরকার। পাক প্রেসিডেন্টের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে ডন পত্রিকা জানায়, প্রেসিডেন্ট খান বলেছেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে পাকিস্তান জাতীয় ঐকমত্যকে দুর্বলভাবে দেখেছে। এছাড়া তিনি বিদেশি সেনাদের চেয়ে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী নিজেরাই ড্রোন বিমান ব্যবহার করুক এ ব্যাপারে কার্যকর পদ্ধতি নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

পাক প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন কিছু ব্যবহার করলে তাতে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়বে না। এ ছাড়া এই বিমানগুলো যদি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করে তা হলে যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে তা বিদেশি বাহিনীর চেয়ে অধিকতর সহায়ক হবে। তিনি আরও জানান যে তিনি ফেইসবুক নিয়মিত ব্যাবহার করেন এবং এই সোশাল মিডিয়াকে যুদ্ধ ড্রোনের সাথে যুক্ত করাতে কোনও সমস্যা দেখেন না। "পরিবর্তন অনিবার্য " বলেন ইমরান খান, "আমরা সেই পরিবর্তনের আগে থাকতে চাই, পিছনে না।"

সুচিত্রা সেন জাদুঘরের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সুচিত্রা সেনের জন্ম বাংলাদেশে, দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা পাবনায়। সেই পৈত্রিক বাড়িতে সুচিত্রা সেন জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হল সম্প্রতি। পাবনা শহরের দিলালপুর মহলায় হেমসাগর লেনে অবস্থিত একতলা ওই বাড়ির মধ্যে সুচিত্রা সেনের অনেক স্মৃতি জরিয়ে আছে।

পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে এরপর কয়েক দশক বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর শৈশব কাটে পাবনায় তার পৈত্রিক বাড়িতে। ১৯৪৭ সালে, অর্থাৎ যে বছর ভারত-পাকিস্তান ভাগ, ওই বছর তার বিয়ে হয় এবং স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় চলে যান।

১৯৬০ সালে সুচিত্রা সেনের বাবা তার বাড়িটি জেলা প্রশাসনের কাছে ভাড়া দিয়ে পরিবার নিয়ে কলকাতায় চলে যান। এরপর দীর্ঘদিন বাড়িটি সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

১৯৮৩ সালে ইমাম গাযযালী ইন্সটিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বাড়িটি ইজারা নেয় এবং এখানে একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল চালু করে। কিন্তু এর প্রতিবাদে স্থানীয়ভাবে গড়ে তোলা হয় সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ।

সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সম্পাদক হলেন রাম দুলাল ভৌমিক। সুচিত্রা সেনের এই পৈত্রিক বাড়িটি উদ্ধারে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন নিরলস ভাবে কাজ করেছে।

সুচিত্র সেনের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি পুনরুদ্ধার করে এখানে তার নামে একটি সংগ্রহশালা করা হয়। মূলত এই দাবিতে বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধন, চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয়রা।

ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় বাংলাদেশের ডিম ব্যবসায়ী সালাম

ফোর্বস ম্যাগাজিন এর শ্রেষ্ঠ ব্যবসা তালিকায় প্রথম বারের মত ঢুকেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ডিম ব্যবসায়ী সালাম।

সালাম এর কোম্পানি "দা ডিম" বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের জন্যে ডিম সরবরাহ করার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন অনেক বছর ধরেই। তিনি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার এর সিআইপি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এবং অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ট্যাক্স দাতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

ফোর্বস ম্যাগাজিন এর সেরা ব্যাবসা তালিকায় নাম এনে তিনি আবার নিজেকে আলোচনায় এনেছেন।

ফোর্বস ম্যাগাজিন তাদের তালিকা প্রস্তুতের বিবরণীতে জানায় যে, সালাম একজন সফল ব্যবসায়ী। বিশেষ করে পুষ্টি সমস্যা দুর করার ব্যাপারে সে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের এক জন ব্যবসায়ীর এই তালিকাতে আসাটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একটা নির্দেশক ও বটে।

সালাম বলেন ১৬ কোটি ভোক্তার দেশ বাংলাদেশে মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ছে এবং চাহিদা বেড়েছে। এই চাহিদা পূরণ করতে "দা ডিম" ব্যাপক সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

তবে, বেশ কয়েকজন মুরগি ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, সালাম চীন থেকে কৃত্রিম ডিম ইম্পোর্ট করে, সস্তায় দেশে সাপ্লাই দিয়ে বেশি পয়সা কামিয়েছেন। তারা বলেন, সালাম এর এই অনৈতিক কার্যকলাপের কারণে সারা দেশে মুরগির ব্যবসা হুমকির মুখে পরে।

তারা সরকারকে সালামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং সালামের পয়সা থেকে সারা দেশের মুরগি ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে আহবান জানান।

বাংলাদেশ থেকে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত কিনতে সম্মত হয়েছে ভারত

বাংলাদেশ থেকে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত কিনতে সম্মত হয়েছে ভারত। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ নিয়ে সরকার এর দুশ্চিন্তা লাঘব করতে এগিয়ে এসেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি জনিয়েছেন, ভারত সরকারের সাথে শীঘ্রই উদ্বৃত্ত বিদ্যুত রপ্তানির জন্যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য যে, বিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশের বিদ্যুত কেন্দ্রগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুত উৎপাদন করছে। এই বিদ্যুত কেন্দ্র গুলোর সাথে চুক্তি মোতাবেক সম্পূর্ণ বিদ্যুত নিতে গেলে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ খরচ হচ্ছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে বিদ্যুত রপ্তানি করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতীয় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অনেক দিন দেনদরবার এর পর বিদ্যুত নিতে রাজি হন ভারতের বিদ্যুত মন্ত্রনালয়। উলেখ্য যে, সীমান্তে বাংলাদেশ কতৃক কাটাতারের বেড়া প্রদানের কারণে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্কে শীতলতা চলছে। তবুও ভারতের অভ্যন্তরে অব্যহত লোড শেডিং এর কারণে, এই চুক্তিতে ভারত লাভবান হবে বলে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা মতামত দিলে, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে বিদ্যুত আমদানির সম্মতি প্রদান করে ভারতের বিদ্যুত মন্ত্রনালয়।

এই বিদ্যুত রপ্তানি করতে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ট্রান্সফরমার সহ অনান্য অবকাঠামো নির্মানে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করতেও সম্মত হয়েছে

এর পর পৃষ্ঠা ০৬ কলমি ৩

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 3

কনসার্ট ফর বাংলাদেশঃ ৫৫ বছর পর

খুব শীঘ্রই রমনা বটমূলে বাম্বা'র আয়োজনে একটা অভূতপূর্ব মেগা কনসার্ট আয়োজন হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে নেপালি ও মিয়ানমার রক দলের সফল কনসার্টের পরে আবারও একটি বিদেশি টিম আসছে, তবে একটা বড় ব্যাতিক্রম আছে। শুধু মাত্র রমনার এই কন্সার্টের জন্য আবার একত্রিত হচ্ছে ১৯৭১ সালের সেই ঐতিহাসিক "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ"-এর শিল্পীরা। এবার তারা করবে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ঃ ৫৫ বছর পার হল"। কন্সার্টে তোলা টাকা দিয়ে জর্জ হ্যারিসন-আলেন গিন্সবারগ স্মৃতিতে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা হবে সাভারে।

প্রাথমিক আলোচনায় ১৯৭১ সালের কন্সার্টের যে শিল্পীরা বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে উৎসাহ জানিয়েছেন, তারা হলেন বব ডিল্যান, রিঙগো স্টার, এরিক ক্ল্যাপটন, ক্লাউস ভুরমান, এবং লীওন রাসেল। রবি শঙ্করের ভূমিকায় আসবে তার মেয়ে অনুশকা শঙ্কর (যিনি সম্প্রতি নরাইলে আসছেন), এবং জর্জ হ্যারিসনের ভূমিকায় আসবে থম ইয়র্ক (রেডিওহেড)।

দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে জর্জ হ্যারিসন ও রবি শংকর কর্তৃক আয়োজিত ১ আগস্ট তারিখে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানের গানের একটি সংকলন কিছুদিন পরেই ১৯৭১ সালে বের হয় এবং ১৯৭২ সালে এই অনুষ্ঠানের চলচ্চিত্রও বের হয়। গত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত চলচ্চিত্রটিকে একটি তথ্যচিত্রসহ নতুনভাবে ডিভিডি আকারে তৈরি করা হয়।

জর্জ হ্যারিসন সর্বপ্রথমে তার প্রাক্তন দল দ্য বিটল্সের সদস্যদের যোগ দিতে বলেন। পল ম্যাকার্টনি সরাসরি অস্বীকৃতি জানান, কারণ তখন মূলত দলের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। জন লেনন অনুষ্ঠানে আসতে রাজি ছিলেন, কিন্তু তিনি সেসময় আদালতে তাঁর সন্তানের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী ইয়োকো ওনোর সাথে আইনি লড়াই চালাচ্ছিলেন বলে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। আর মিক জ্যাগার তখন ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁর পক্ষেও আসা সম্ভব হযনি।

শেষ পর্যন্ত বিটলসের একমাত্র রিঙ্গো স্টার তাঁদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম হন। সাথে আরো যোগ দেন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রেস্টন, হ্যারিসনের নতুন দল ব্যাড ফিঙ্গারের যন্ত্রীদল ও আরো অনেকে।

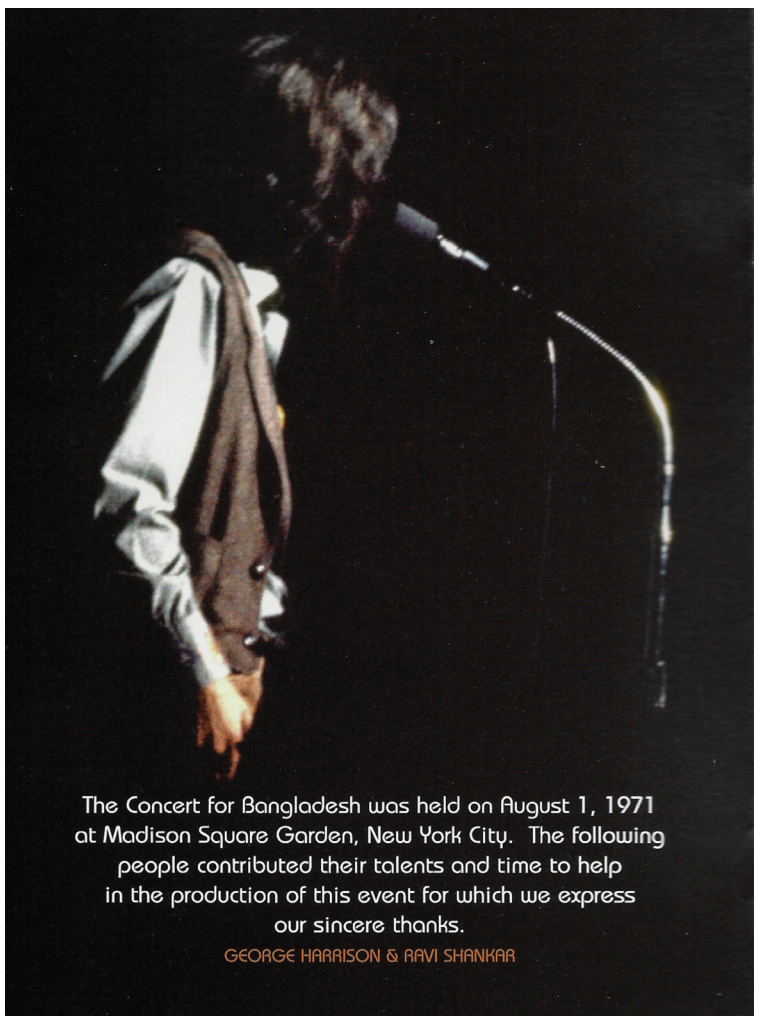

সেতারবাদক রবি শংকর ও বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খান যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁদের সাথে তবলায় ছিলেন ওস্তাদ আল্লা রাখা খান। তাঁরা বাংলা ধুন নামে একটি ধুন পরিবেশন করেন।

বিটল্স ভেঙে যাওয়ার পর এই অনুষ্ঠানই ছিলো হ্যারিসনের সরাসরি অংশগ্রহণ করা প্রথম অনুষ্ঠান। এরিক ক্ল্যাপটনও এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রায় পাচ মাস পর কোনো সরাসরি অনুষ্ঠানে গান গাইলেন এবং বব ডিলানও ১৯৬৯ সালের পর প্রথমবারের মতো শ্রোতা দর্শকদের সামনে এলেন। জর্জ হ্যারিসনের লেখা "বাংলা দেশ" গানটি পপ চার্টে ১ম স্থান অধিকার করে।

কন্সার্টের আয়োজকরা রেনেসাঁ দলকে আহবান করেছে এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হতে। রেনেসাঁ দলটি "বাংলাদেশ" নামের দুটি বিখ্যাত গান (একটি জর্জ হ্যারিসনের, আরেকটি জোন বায়েজের গাওয়া) নতুন রেকর্ডিং করে তাদের "একাত্তরের রেনেসাঁ" (১৯৯৮) অ্যালবামের জন্য।

সুন্দরবনে রহস্যজনক ভাবে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আবার সুন্দরবনে বিচরণ করছে। প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, যা গত ৫০ বছরের ধারার বিপরীতে যায়। বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকারের সাথে কাজ করছে। ধারনা করা হচ্ছে ভারতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে ভারতীয় বাঘ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। বাংলাদেশে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার অনুমতি না মেলাতে ভারতীয় সরকার সেটি ভারতের সুন্দরবন অংশে তৈরি করেছে।

সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। অববাহিকার সমুদ্রমূখী সীমানা এই বনভূমি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত । সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর বাংলাদেশ ও ভারতীয় অংশ একই নিরবচ্ছিন্ন ভূমিরূপের অংশ হলেও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের সূচিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে সূচিবদ্ধ হয়েছে: যথাক্রমে সুন্দরবন ও সুন্দরবন জাতীয় পার্ক নামে।

সুন্দরবন প্রায় ৫০০ রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাঘের আবাসস্থল যা বাঘের একক বৃহত্তম অংশ। স্থানীয় লোকজন ও সরকারীভাবে দ্বায়িত্বপ্রাপ্তরা বাঘের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। স্থানীয় জেলেরা বনদেবী বনবিবির প্রার্থণা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে যাত্রা শুরুর আগে। সুন্দরবনে নিরাপদ বিচরণের জন্য বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের কাছে প্রার্থণা করাও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে জরুরি। বাঘ যেহেতু সবসময় পেছন থেকে আক্রমণ করে সেহেতু জেলে এবং কাঠুরেরা মাথার পেছনে মুখোশ পরে। এ ব্যবস্থা স্বল্প সময়ের জন্য কাজ করলেও পরে বাঘ এ কৌশল বুঝে ফেলে এবং আবারও আক্রমণ করতে থাকে। সরকারি কর্মকর্তারা আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড়দের প্যাডের মত শক্ত প্যাড পরেন যা গলার পেছনের অংশ ঢেকে রাখে। এ ব্যবস্থা করা হয় শিরদাঁড়ায় বাঘের কামড় প্রতিরোধ করার জন্য যা তাদের পছন্দের আক্রমণ কৌশল।

যেহেতু সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সেহেতু তুলনামূলকভাবে এখানকার পানি নোনতা। এখানকার অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বাঘই মিঠাপানি খায়। কেউ কেউ মনে করে পেয়পানির এই লবণাক্ততার কারণে বাঘ সার্বক্ষণ অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকে যা তাদের ব্যপকভাবে আগ্রাসী করে তোলে। কৃত্রিম মিঠাপানির হ্রদ তৈরি করে দিয়েও এর কোনো সমাধান হয়নি। উঁচু ঢেউয়ের কারণে বাঘের গায়ের গন্ধ মুছে যায় যা প্রকৃতপক্ষে বাঘের বিচরণ এলাকার সীমানা চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। ফলে নিজের এলাকা রক্ষায় বাঘের জন্য উপায় একটাই, আর তা হলো যা কিছু অনুপ্রবেশ করে তা বাঁধা দেয়া। অন্য একটি সম্ভাবনা এমন যে আবহাওয়ার কারণে এরা মানুষের মাংসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের এ অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। আর স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া এসব গলিত মৃতদেহ বাঘ খায়। আর একটি সম্ভাবনা হলো এরকম যে, নিয়মিত উঁচু-নিচু স্রোতের কারণে বাঘের পশু শিকার করা কঠিন হয়ে যায়। আবার নৌকায় চড়ে সুন্দরবন জুড়ে মাছ ও মধু সংগ্রহকারী মানুষ বাঘের সহজ শিকার হয়ে ওঠে। এছাড়াও মনে করা হয় যে আবাসস্থলের বিচ্ছিন্নতার কারণে এই অঞ্চলের বাঘ তাদের শিকার করার বৈশিষ্ট্য বদলে ফেলেছে যা ২০ শতক জুড়ে ঘটেছে। এশিয়ার বাকি অংশে বাঘের মানুষভীতি বাড়লেও সুন্দরবনের বাঘ মানুষকে শিকার বানানো বন্ধ করবে না হয়তো।

কয়েক দশক আগেও, বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিলো। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো এই বাঘ আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিল। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো।

বাংলাদেশে সুন্দরবনই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু এই প্রাণী খুব সুন্দর এবং এর চামড়া খুব মূল্যবান। তাই চোরা শিকারিদের কারণে এই প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যচ্ছে। তাছাড়া বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া,খাবারের অভাব এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এই প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে গত পাঁচ বছর আবৈধ শিকার বন্ধ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষন করার কারণে বাঘের বিলুপ্তি থেমেছে। তবে বাঘের সংখ্যা আবার কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেঁটা এক রহস্য। কেউ কেউ ভাবছেন ভারতের সুন্দরবন অংশে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার পর থেকেই ভারতীয় বাঘ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২০ কিমি এর মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়না। ভারত এই নিয়মের ব্যাতিক্রম করায় এখন হয়ত প্রানবৈচিত্র হারাচ্ছে।

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 4

সম্পাদকীয়

গন্তব্য ইউটোপিয়া

নাঈম মোহায়মেন

ইতিহাসের বোঝা কাঁধ থেকে নামাই কিভাবে? বিগত ৬ দশকের ঘটনার দিকে যদি খুব কাছে থেকে তাকাই, তবে আশাবাদী হবার জায়গা বেশির চাইতে কম। তারপরও আমরা আশা করি, স্বপ্ন দেখি। ইউটোপিয়া এমন এক গন্তব্য যে হাজার বিফলতার পরেও আমরা আশা ছাড়ি না।

দেশের নাম 'কোথাও নয়' আর তার রাজধানীর নাম 'আবছায়া', এমন একটি কাল্পনিক দ্বীপ-দেশকে অবলম্বন করে ষোড়শ শতকের ইউরোপের মনীসী স্যার টমাস মোর একটি আদর্শ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্প রচনা করেন 'ইউটোপিয়া' নামের গ্রন্থের মাধ্যমে।গ্রন্থখানির রচনা কাল ১৯১৫-১৯১৬, ল্যাটিন ভাষায়। ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৫১ সাল। সেই থেকে এই শব্দ, এবং এই স্বপ্নের যাত্রা শুরু।

আমার এক বন্ধু অন্য ভাবে বলে কথাটা। "স্বপ্নে যদি পোলাও খাব, তবে ঘি দিয়েই খাব।" কথাটা শুনে মজা পাই প্রতিবার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আজকের দুনিয়ায় আমরা কোন স্বপ্ন দেখার অধিকার রাখি?

১৯৭৭ সালে ঢাকায় জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাইয়ের নেপথ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়েও ভেবেছিলাম, এরা সবাই কি স্বপ্ন দেখছিল? ওরা কি ভেবেছিল হবে? এবং শেষে কি হল?

বেগম রোকেয়াও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন (এই পত্রিকায় পাতা ১৪)। কিন্তু কেন শেষে দর্শকদের তিনি জাগিয়ে তুললেন (আমরা কিন্তু তা করিনি)? আজকে যে সৌদি মহিলা শুধু গাড়ি নয়, নিজের দেশ চালাবার অধিকারের জন্য লড়ছে, তাকে বেগম রোকেয়া কি বলবেন? জেগে উঠ, নাকি ঘুমিয়ে থাক? কোন পথে মুক্তি?

হুমায়ুন আজাদ এই বিষয় নিয়ে ভাবতেন, তবে তার লেখা ছিল ইউটোপিয়া'র উলটো। যেখানে ১৯৭১-এ আমরা হেরে গেছি, দেশ চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। তিনি বলতেন, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ তিনি দেখে যেতে পারেন নাই, কিন্তু বলেছিলেন, "অমরতা চাই না আমি, বেঁচে থাকতে চাই না একশো বছর; আমি প্রস্তুত, তবে আজ নয়। আরো কিছুকাল আমি নক্ষত্র দেখতে চাই, শিশির ছুতেঁ চাই, ঘাসের গন্ধ পেতে চাই, বর্ণমালা আর ধ্বনিপুঞ্জের সাথে জড়িয়ে থাকতে চাই, মগজে আলোড়ন বোধ করতে চাই। আরো কিছুদিন আমি হেসে যেতে চাই। একদিন নামবে অন্ধকার-মহাজগতের থেকে বিপুল, মহাকালের থেকে অনন্ত; কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি আরো কিছু দুর যেতে চাই"

পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনও এক সময় চলে গেল। যেতে ত হবে, কেউ কি সারা জীবন বাঁচে? ব্লেইড রানারের শেষ দৃশ্যে দয়ালু পুলিশ হ্যারিসন ফোরডকে বলে, "দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে সে সারাজীবন বাঁচবে না! কিন্তু কেই বা বাঁচে?"

আসিফ এন্তাজ রবি লিখেছিল, "আমি আর আমার বাবা টিভি দেখছি। মোটর সাইকেলের সামনে উত্তম কুমার, পেছনে সুচিত্রা। এই পথ যদি শেষ না হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? এক সময় আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। উত্তমের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করছি। আমার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে সুচিত্রা। ওর চুল উড়ছে বাতাসে। আমার স্বপ্নের বাইক ছুটে চলছে সুচিত্রাকে নিয়ে।

কোনও ঘোরই চিরস্থায়ী নয়। কাজেই এক সময় ঘোর কাটলো। মনে মনে সুচিত্রাকে বাইকের পেছনে কল্পনা করায় আমার লজ্জাই লাগতে লাগলো। আড়চোখে তাকালাম বাবার দিকে। চমকে উঠলাম। ওমা। তিনিও হা করে তাকিয়ে আছেন পর্দার দিকে। খুব সম্ভবত, উত্তম কুমারের জায়গায় তিনিও নিজেকে বসিয়ে ফেলেছেন। তার পেছনে সুচিত্রা। হে সুচিত্রা, তুমি পিতাপুত্রকে একই ঘোরে বেঁধে রেখেছো দীর্ঘকাল। সুচিত্রা তুমি চলে যেও না। সুচিত্রা তুমি চলে যেতে পারো না। তুমি চলে গেলে আমার কি হবে? তুমি চলে গেলে আমার বাবারই বা কি হবে?"

আমরা আরও কিছু দুর যেতে চাই। শুধু ১০ বছর ভবিষ্যৎে গিয়ে ক্ষান্ত হতে চাই না, আরও ১০০ বছর যেতে চাই। কেমন হবে তখন আমাদের এই দেশটা?

আমরা কিন্তু অন্য ভাবে দেখি ভবিষ্যৎ। এখনও অলিখিত। আজকের দুনিয়ায় আমরা যেকোন স্বপ্ন দেখার অধিকার রাখি।

সম্পাদক মন্ডলী

সম্পাদকঃ নাঈম মোহায়মেন
অলঙ্করণঃ সামিউল ইসলাম
লোগোঃ সায়ীদ আহমেদ
প্রকাশকঃ আরিফুর রহমান মুনির
যোগাযোগ: station.utopia@gmail.com

কিউরেটরঃ ডায়ানা ক্যাম্বেল্ বেটানকোর্ট
বুথ ডিজাইনঃ থিএরী বেটানকোর্ট
প্রযোজকঃ সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশান

তথ্য ও লেখনী সূত্রঃ উইকিপিডিয়া (ফিলিস্তিন, ড্রোণ, ভাসানী, ক্লার্ক, রবি শঙ্কর, নজরুল, আমিরাত, কলকাতা, লালন, ট্রেন, সুন্দরবন, যুদ্ধাপরাধ, ১৯৭১, জলবায়ু পরিবর্তন, মঙ্গল গ্রহ, অভিধান), আদিল মাহমুদ (শত্রু সম্পত্তি), মানব কণ্ঠ (ড্রোণ), বিবিসি (বাস্কেটবল, সুচিত্রা সেন), ঠোঁটকাটা নারীবাদী ব্লগ (সুস্মিতা চক্রবর্তী), তানজিনা আফরিন ইভা (লালন), মৃনাল চৌধুরী (শ্রমিক আন্দোলন), সাঈদ আহমেদ (১৯৫ যুদ্ধাপরাধী), আদনান শামিম (হাতের লেখা), ধুমকেতু (ফারুক ওয়াসিফ), আনু মোহাম্মদ, আসিফ এন্তাজ রবি ।

কাল্পনিক অংশগুলো লিখেছে জিয়া হাসান (ফোরবস, গাম্ভির, বিদ্যুৎ, দোয়েল, গরু) ও নাঈম মোহায়মেন (বাকি)।

ছবিঃ নাঈম মোহায়মেন (কলকাতা, আমিরাত, আদিবাসী, দুর্গা, ১লা মে, লালন, ট্রেন), টেইলর শিল্ডস (ফেলানী মডেল), হাইথাম খাতিব (ফিলিস্তিন), এপি (ক্লার্ক), সমারি চাকমা (ছাত্র), পোসট (ড্রোন), গেটি (শঙ্কর), গ্লোব (লিটলফেদার), বাফুফে (ফিফা), নাসা (মঙ্গল), ডেমটিক্স (গরু)।

সহায়তাঃ ইয়াসমিন বেগম, জাইদ ইসলাম, হুমায়ুন কবির, নাইমা কায়ুম, ফারাহ মেহরিন আহমেদ, হাবিবা খন্দকার, হাসান ফেরদৌস, আশরাফুল বুলবুল, জ্যোতি রহমান, এবং আলালওদুলাল ব্লগের সম্পাদকেরা।

ধন্যবাদঃ রাজীব ও নাদিয়া সামদানি

রঙিন বলেই ভাল

সুস্মিতা চক্রবর্তী

মানুষের শারীরিক মূল গঠন নিজের একার তৈরি নয়। প্রতিটি মানুষই তার পূর্বনারী-পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা নিয়ে আসে। সেখানে কেউ হয় সাদা আর কেউবা কালো, বাদামি বা আরও নানা বর্ণের (অন্য দেশের হলে)। এমনকি, মানুষের চোখ-চুল-নখ-দাঁত-কপাল-ভ্রু সমস্তটাও এভাবেই আসে। পরবর্তী সময়ে, বিভিন্ন সামাজিক নির্মাণ-মানদন্ডের ভিত্তিতে মানুষ একেক জনকে 'সুন্দর' বা অসুন্দর'-এর তকমা সেঁটে দেয়! যদিও সৌন্দর্য আরও বড় কিছু। মানুষের শারিরীক, আত্মিক, রুচি, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরন আর কাজের মেলবন্ধনের মাধ্যমে প্রকৃত সৌন্দর্য বিকশিত হয়। সেখানে সাজসজ্জা থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রকৃত 'সুন্দর' থেকে তাই এক ধরনের জ্যোতি ঠিকরায়। এর সাথে চামড়ার বিশেষ কোনো সম্পর্কই নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে বিশেষ বিশেষ গোত্রের মানুষ রয়েছে। একপক্ষ সাদা চামড়াকেই সৌন্দর্য জ্ঞান করে আবার অপর-পক্ষ, যারা কিনা সঙ্গত কারণে সাদা চামড়ার প্রভুত্বপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্রেফ ভুলেই বসে থাকে যে, চামড়ার এই রকমফের-এ মানুষের আদতে তেমন কোনো হাত-ই নাই! ফলে, তারা কালো চামড়ার জয়গান করতে গিয়ে নিজেই ফের একইভাবে সাদা চামড়ার প্রতি ঢালাওভাবে বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। সাদা চামড়ার প্রভুত্ব-এর কথা আমরা জেনে এসেছি এমনকি এই প্রভুত্ব এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে বর্ণবাদিতার মতো ভয়ঙ্কর সংস্কৃতি পৃথিবীকে কম গ্রাস করে নাই। এমনকি, এখনও করছে।

কিন্তু এর বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে যদি ফের সেই বর্ণবাদিতার খপ্পরেই থাকতে হয় তবে সেটা সমাজের জন্য ইতিবাচক কিছু বয়ে আনে না। বরং পালাপাল্টির একটা সংস্কৃতি সর্বদা জারি থাকে। একপক্ষ তখন কালো চামড়া দেখলেই আঁৎকে ওঠে আবার বিপরীতে, অন্য পক্ষ, 'সচেতন-রাজনীতি'র নামে ঢালাওভাবে সাদা চামড়া দেখলেই বিষোদগার করে। ফলে, এই পক্ষ-বিপক্ষের রাজনীতির আর সুরাহা হয় না। এর সাথে আবার জুটেছে কর্পোরেট-মিডিয়া-বিজ্ঞাপন-এর নিত্য নতুন ব্যবসার নানান ফায়দা। এত দিন তারা কেবল সাদা চামড়ার পক্ষে নানান প্রচারণা চালিয়েছে। এখন দিন খানিক বদলেছে কিন্তু বিদ্যমান এই সমস্ত পুজিঁবাদী-ব্যবসানির্ভর-কর্পোরেট-মিডিয়া-সংস্কৃতির খুব তেমন বদল ঘটে নাই। ফলে, এখন আবার, এরাই কালো চামড়াকে নিয়ে মেতে ওঠেছে। 'সুন্দরী প্রতিযোগিতায়' এখন আর স্রেফ সাদা নয়, কালোর মাথায়ও একইভাবে মুকুট তুলে দিচ্ছে তারা।

আপাতভাবে বিষয়টা আনন্দের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষত নারীর জন্য একজন মানুষ হিসেবে, শেষ পর্যন্ত এটা প্রকৃত সম্মান বয়ে আনে না! বরং সাদা আর কালোর বর্ণবাদিতার অবসান ঘটিয়ে নারীকে নিয়ে কর্পোরেট-মিডিয়া-বাণিজ্যের এই খোলামখুচি ব্যবসা করার পায়ঁতারার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি। অনেক জরুরি সৌন্দর্য নামক ধারণার বদল ঘটানো। স্রেফ নারী-শরীরকে পুঁজি করে সারা বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বন্যা নানাভাবে বয়ে চলেছে তার বিপক্ষে অবস্থান আর প্রচারণাই আজকের দিনে নতুন রাজনীতির বোল হিসেবে অহর্নিশি ফোটা দরকার। যদিও আমরা জানি, আজ আর কেবল নারী নয় সকল কিছুই পণ্য-এর মোড়কে মোড়া। তারপরও শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে যে ব্যাপক কর্পোরেট-মিডিয়া-বাণিজ্যবেসাতির সহজলভ্য হাতছানি, এর বাস্তবতাকে কৌতূহলী চোখ এড়াতে পারে না।

তাই এই সমস্ত নারীর শরীর আর যৌনতা-নির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যের সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেওয়া জরুরি। আর বিশেষত, নারীর জন্য তো বটেই। বাস্তবের লড়াই-সংগ্রাম সমাজে সকল নারীর জন্যই কম-বেশি বলবৎ থাকে। এগুলোকে পাশ কাটিয়ে কেবলমাত্র শরীর-সৌন্দর্য আর যৌনতানির্ভর নারীকেন্দ্রীক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসান ঘটা দরকারি। বর্ণবাদিতার অবসান ঘটাতে গিয়ে নতুন করে আবারও বর্ণবিদ্বেষের অঙ্কুরোদগম করা উচিত নয়। বরং নারীকে এই সমস্ত থেকে বের করে মানুষরূপে দেখতে শেখা বোধ হয় অনেকখানি সম্ভাবনাময় দিকের ইঙ্গিতবাহী। তাই পুরোনো হলেও কবির সেই কবিতাই বার বার এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হতে পারে: 'কালো আর ধলা বাহিরে কেবল/ ভেতরে সবারি সমান রাঙা' কিংবা অধুনা গানের কথায়: 'কেউ সাদা কেউ কালো/ রঙিন বলেই ভাল/ রঙমশালটা একলা জ্বেলো না/ আমার মনেও জ্বালো।'

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 5

আমরা পৃথিবীর ৯৯%

আনু মুহাম্মদ

দেশে দেশে একই শ্লোগান দিয়ে মানুষ উঠে আসছে রাস্তায়। শ্লোগানের মূল কথা দুটো; একটি, নিজের পরিচয় ঘোষণা: 'আমরা ৯৯%'। আরেকটি, আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষণা: 'দখল কর'। কী দখল? দখল ক্ষমতার কেন্দ্র, দখল নিজের দেশ, দখল নিজের জীবন। প্রকৃত অর্থে নিজের জীবন, সম্পদ ও দেশ দখল করেছে শতকরা ১ ভাগ লুটেরা, দখলদার, যুদ্ধবাজ সন্ত্রাসী। লক্ষ্য এসব দখলমুক্ত করা। কেননা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

গত কয়েক মাস ধরে ইউরোপের বহু শহরে লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ আমরা দেখেছি। যুক্তরাষ্ট্রে এর শুরু গত ১৭ সেপ্টেম্বর 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট' বা 'ওয়াল স্ট্রীট দখল কর' এই ডাক দিয়ে। ২০১১ সালে যেই আন্দোলন শুরু হয়, ১২ বছর পর আবার তা ফিরে এসেছে। প্রথম দিকে বড় বড় সংবাদ মাধ্যম এটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ায় তারা নীরবতা ভাঙতে বাধ্য হয়েছে। 'আমরা ৯৯%' এবং 'দখল কর' এই দুটো শোগান খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে দেশে মানুষ এই দুটো শ্লোগান ধরেই নিজেরাও সংগঠিত, সমবেত ও বিস্তৃত হচ্ছে। ওয়াল স্ট্রীটের পর নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ভ্যানকুভার, টরন্টো, লন্ডন, রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ, টোকিও কিংবা দেশ নাম ধরে দখল করবার আওয়াজ উঠছে। পাকিস্তানে সব বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে ২২ অক্টোবর থেকে লাহোরে 'এন্টি ক্যাপিটালিস্ট ক্যাম্প' নামে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করছে, অন্যান্য শহরেও পরিকল্পনা আছে। ভারতেও বিভিন্ন শহরে প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশেও শুরু হচ্ছে ২২ তারিখ।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলনকারীদের ওয়েবসাইটে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে মিছিলে শ্লোগানে আসছে- পুরো ব্যবস্থা শতকরা ১ ভাগ লুটেরার দখলে। প্রথমে এই রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে মোহমুক্তি, পরে এই শতকরা ১ ভাগকে লক্ষ্য করে ঘৃণা ও প্রতিরোধের জমায়েত। ৯৯ ভাগ তাদের জীবন আর সম্পদে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এসব সমাবেশের অনেক স্থানে মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি। উপস্থিত মতো শক্তিশালী বিকল্প বের হয়েছে। খালি গলায় একজন বলে তো শতজন তা ছড়িয়ে দেয়, হাজারজন তার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে। অংশগ্রহণকারীরা বলে, 'এই তো, আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।' এই প্রতিরোধ, মানুষের পক্ষে মানুষের লড়াইএর মতো সৃজনশীল কাজ আর কী? তাই হাজার শহরে এসব সমাবেশে শিল্পী লেখক কবিদের উপস্থিতিও অনেক। গান নাটক কবিতা তৈরি হচ্ছে পথেই। নিউইয়র্কের লিভিং থিয়েটারের জুডিথ মেলিনা ওয়াশিংটনে বিশাল উপস্থিতির সামনে বলেছেন, 'এটা দেখার জন্যই এতদিন বেঁচে আছি।' তাঁর বয়স এখন ৮৫।

ওয়াল স্ট্রীট-এর কাছের পার্কে যখন বিক্ষোভকারীরা দিনের পর দিন অবস্থান করছেন তখন এক পর্যায়ে নোটিশ এলো, পার্ক পরিষ্কার করা হবে, এর জন্য পার্ক ছাড়তে হবে সবাইকে। সাথে সাথে বিক্ষোভকারীরা নিজেরাই বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পার্ক পরিস্কার করবার কাজে লেগে গেলেন। সকালের মধ্যে পার্ক এত পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ঐ বাহানা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলো। সাধারণ সভা বসে প্রতিদিন। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন দল। সবই শান্তিপূর্ণ, অহিংস। আবার আক্রমণ এলে তার মোকাবিলার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণও চলছে।

ফেডারেল রিজার্ভ বা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শতকরা ১ ভাগের ১ দশমাংশের স্বার্থরক্ষায় ৯৯ ভাগ মানুষের জীবন বিপন্ন করবার অভিযোগ উঠেছে এই আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকাশনা, ভিডিও ও সমাবেশের পোস্টারে। এই সংস্থার দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান এলান গ্রীন্সপ্যানের গ্রন্থ 'এজ অব টারবুলেন্স' পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন ফেডারেল রিজার্ভ এবং ওয়াল স্ট্রীট একেবারেই অভিন্ন। হোয়াইট হাউস আসলে চালায় এরাই। অনেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কার্যত বিভিন্ন কোম্পানির লবিষ্ট হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশেও এই লবিষ্টদের কাউকে কাউকে আমরা মাঝে মধ্যে আসতে দেখি। যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো তো চলে সেই দেশের জনগণের টাকাতেই, কিন্তু সেগুলোর কাজও থাকে বস্তুত বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায়ড়ক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। উইকিলিকস কেউ ভালভাবে খেয়াল করলে বাক্যে বাক্যে এর স্বাক্ষর পাবেন। যুক্তরাষ্ট্র তাই তার বিপুল সম্পদ, অন্য দেশ দখল করা সম্পদ কমই জনগণের কল্যাণে ব্যয় করে, করতে পারে। নিশ্চিত কাজ, বাঁচার মতো মজুরি, আশ্রয় ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা এগুলোর কোনটাই যুক্তরাষ্ট্রে টেকসই হতে পারেনি। শ্রমিক বা পেশাজীবীদের কাজ মজুরির অধিকার সংগঠনের অধিকার শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচাইতে কম। এমনকি যে মে দিবসের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, যে দিবস পালিত হয় সারা বিশ্বে, সেই দিবসটিও রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃত, মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টায়।

ঋণ করে আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি করবার মধ্য দিয়ে একটি কৃত্রিম স্বচ্ছলতাতেই অভ্যস্ত করা হয়েছে মানুষকে। নিয়মিত যা আয় তা দিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ভোগের উন্মাদনা তৈরি হয়না। আর এই উন্মাদনা ছাড়া পুঁজিবাদ টিকতেও পারে না। একদিকে দুর্বল দেশগুলো থেকে কম দামে খাদ্য থেকে শুরু করে সবধরনের পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে অন্যদিকে বিস্তার ঘটানো হয়েছে ঋণ বাজার। দুর্বল দেশগুলোকে এই খাপে মেলানোর জন্য সেখানে রফতানিমুখি উন্নয়নের দর্শন আরোপ করা হয়েছে। ভুলভাবে 'উন্নয়ন সংস্থা' বা 'দাতা সংস্থা' হিসেবে চিত্রিত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কার্যত ওয়াল স্ট্রীট ও ফেডারেল রিজার্ভের অধীনস্ত দুটো প্রতিষ্ঠান। এদের কাজ প্রধানত বিশ্বের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির 'সংস্কার' করতে জাল তৈরি করা। এসবের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র দেশগুলোতে ভোগবাদিতা প্রসারিত হয়েছে। বিস্তৃত হয়েছে ঋণ ব্যবসা। প্রান্ত দেশগুলোতে উজাড় হয়েছে বন, দুষিত হয়েছে পানি, রফতানিমুখি ও আমদানিমুখি একগুঁয়ে যাত্রায় অর্থনীতি নাজুক অবস্থায় পড়েছে, জ্বালানী ও খাদ্য নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে যেসব দেশ থেকে উজাড় করে তেল, গ্যাস, সোনা, হীরাসহ নানা খনিজ দ্রব্য, কাঠসহ নানা বনজ দ্রব্য, কোকো, কলাসহ নানা ফলজ দ্রব্য এসেছে সেসব দেশে দারিদ্র পশ্চাদপদতা কিছুই দূর হয়নি, বেড়েছে বৈষম্য, নির্যাতন আর অনিশ্চয়তা। আর এগুলোর দখল নিশ্চিত রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ খাতে ব্যয় বেড়েছে, মানুষের জন্য অর্থ সংকট বেড়েছে।

অধিক মুনাফার সন্ধানে ফটকাবাজারী ও জুয়ার বিস্তৃত জালও তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার শুরুর পর থেকে পুঁজির গতি বেড়ে যায় অসম্ভব হারে, জাতীয় সীমানা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থকরী খাতে, ফটকাবাজারীতে বিনিয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। তাদের স্বার্থে পুঁজির উপর সবরকম নিয়ন্ত্রণ ক্রমে শিথিল হওয়ায় পরিমাণ ও গতি দুটোরই বৃদ্ধি ঘটে অভূতপূর্ব মাত্রায়। খাদ্য ও তেল-এর উপর ফাটকা বিনিয়োগে আগে যে নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ ছিল সেটাও প্রায় অকার্যকর করা হয় বছরদশেক আগে। এর পরিণতি বোঝা যায় ২০০৮ সাল থেকে যখন তেল ও খাদ্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং অস্থিতিশীলতাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের সাথে অসমানুপাতিক হারে অর্থকরী খাতের এই ফুলে ফেঁপে উঠার ঘটনাটিকে বাজার অর্থনীতির শক্তি, পুঁজিবাদের সংকট মোচনের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সকলের ধনী হবার উপায় বলে মহিমান্বিত করবার মতো তত্ত্ব ও অর্থনীতিবিদের সরবরাহও বাড়ে তখন।

কিন্তু ২০২২ থেকে শুরু হয় এই ভারসাম্যহীনতা, কৃত্রিম জৌলুস ও প্রতারণা দিয়ে ফোলানো বেলুন ফোটা। ধ্বস নামে একের পর এক, তাসের ঘরের মতো একে একে ধ্বসে পড়ে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির বিশাল বিশাল ব্যাংক বীমা এবং সাথে সাথে নানা সংস্থা। এগুলোর ঐশ্বর্য্যের পেছনে যে কত মিথ্যাচার, দুর্নীতি ও জালিয়াতি ছিল তা একে একে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়। রাতারাতি দৌর্দন্ডপ্রতাপী ধনী সফল ব্যক্তিবর্গ প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সংকট তাদের কমই শায়েস্তা করতে পেরেছে। এসব কর্মকান্ডে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে কর্মসংস্থানে সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার ভার তৈরি হয় তার প্রায় পুরোটাই পড়ে কম আয়ের মানুষদের উপর, সারা বিশ্বের। এই ভার এখনও বাড়ছেই।

বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষুদ্র পরিচালকমন্ডলীর প্রভাবশালী সদস্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হরদম বলে যাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি গভীর সংকটের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটা স্বীকার করা তাদের পক্ষে কী করে সম্ভব যে এই অবস্থা সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকাই অন্যতম। আর ফেডারেল রিজার্ভের আজ্ঞাবহ হিসেবে তাদের নীতি ও দর্শন নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেছে একচেটিয়া পুঁজি বা ওয়াল স্ট্রীটকে, শৃঙখলিত করেছে মানুষকে, ফটকা বাজার আর ডেরিভেটিভের বায়বীয় অর্থনীতিকে দানবীয় আকার দিয়েছে, দেশে দেশে অর্থনীতির সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করেছে, শিক্ষা চিকিৎসা, পানিসহ সর্বজনের সম্পদকে বেসরকারিকরণের নামে মুনাফার বলি করেছে। এসব তৎপরতা সম্পদ ও সম্ভাবনাকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পুঁজিকে ঈশ্বরের অবস্থানে নিয়ে গেছে, যুদ্ধ, দখল আর লুন্ঠনকে অনিবার্য করে তুলেছে।

এই নীতিকাঠামো অব্যাহত রেখে এই সংকট দূর করার আসলেই কোন রাস্তা নাই। পুরনো ওষুধ দিয়ে কাজ হবে এই মোহবিস্তারের খেলা আর এখন চলবে না।

জোরদার কংক্রিট

ফারুক ওয়াসিফ

ষাঁড়ের দুর্নাম এ জন্য যে তাকে বশ্যতা মানানো কঠিন। আর লালের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ। শত্রুদের কাছে তিনি ষাড়ের মতোই বেপরোয়া আর বন্ধুদের কাছে কঠিন ভরসা। সেই লাতিন আমেরিকান ষাঁড় হুগো চাভেজ যার কথা আজ স্মরণ করতে চাই।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয়বার নির্বাচনের হিসাবে ১৩ বছরে তাঁর ১৪টি বিজয় ছিল। একাই জেতেননি তিনি, তাঁর সঙ্গে জিতেছিল লাতিন মহাদেশ। প্রতিপক্ষ হেনরিক কাপ্রিলেসও একাই হারেননি, হেরেছে তাঁর সমর্থক পুঁজিবাদের দুর্গ যুক্তরাষ্ট্রও। এই জয়ে খুশি হয়েছিল ভেনেজুয়েলার বন্ধু চীন-রাশিয়া-ইরান-সিরিয়াও।

লাতিন আমেরিকান এই ষাঁড় ভেতর-বাহিরে যে লড়াই চালিয়েছিলেন, নির্বাচনে দুটোরই জয় হয়েছিল। একদিকে তিনি স্বদেশেরই মার্কিন-পসন্দ শাসকগোষ্ঠীকে দেশের তেল-গ্যাস সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ঠেকালেন। অন্যদিকে কিউবা, বলিভিয়া, নিকারাগুয়াসহ লাতিনের বামপন্থী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের দাপটও সামলালেন। স্বাধীনচেতা গণমুখী এই চরিত্রের কারণেই পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো তাঁকে 'স্বৈরশাসক' ডাকত।

তিনি এমনই এক 'স্বৈরশাসক', যিনি ১৩টি নিরপেক্ষ নির্বাচন জিতেছিলেন। তিনি এমনই এক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, যে আন্দোলন গণতন্ত্রকে জনমানুষের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। তিনি এমনই এক পার্টির নেতা, যে পার্টির কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছিল।

চাভেজের শাসনামলের ১৩টি বছরে ভেনেজুয়েলা থেকে নিরক্ষরতা বিদায় নিয়েছিল। বাজেটের ৪৩ শতাংশেরও বেশি ব্যয় হয়ে আসছে সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে। বেকারত্ব ২০ থেকে ৭ শতাংশে নেমেছে। ১০ বছরে নির্মিত হয়েছে ২২টিরও বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকের সংখ্যা ৬৫ হাজার থেকে হয়েছে সাড়ে তিন লাখ। চলছে শতবর্ষ ধরে আটকে রাখা কৃষি সংস্কার কার্যক্রম। হাতে নিয়েছিলেন ২০ লাখ পরিবারের জন্য আবাসন কর্মসূচি।

চাভেজ এসব পেরেছিলেন, কারণ তাঁর হাতে ছিল বিশ্বের বৃহত্তম প্রমাণিত তেলের মজুদ। সম্পদ প্রায়ই বিপদের কারণ হয়, যদি তা সুবিধাবাদী নেতৃত্বের হাতে পড়ে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে যা হয়, চাভেজের আগে ভেনেজুয়েলার তেল-রাজস্বের ৮০ শতাংশই বিদেশে চলে যেত।

সম্পদ স্থানান্তরের এই গতিকে চাভেজ ঘুরিয়ে জনমুখী করেছিলেন। সবচেয়ে যা বড়, চাভেজের 'একুশ শতকের সমাজতন্ত্র' বৈষম্যের সমাজকে সাম্যের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল। হতদরিদ্র, ভূমিহীন, বাস্তুহীনেরা সেখানে এখন নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন পেতে পারছে। লাতিন আমেরিকার মধ্যে ভেনেজুয়েলার গিনি কো-অ্যাফিশিয়েন্ট সর্বনিম্নে, এর অর্থ সেখানে বৈষম্য সবচেয়ে কম। এসবই চাভেজের নির্বাচন জয়ের জাদু।

জীবনের এই শেষ নির্বাচনে চাভেজের মেনিফেস্টো ছিল পাঁচ দফায় সজ্জিত: '১. জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা, বিস্তার ও সংহত করা, ২. ধ্বংসাত্মক ও বর্বর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ভেনেজুয়েলায় একুশ শতকের বলিভীয় সমাজতন্ত্র নির্মাণ চালু রাখা, ৩. লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান শক্তিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে ভেনেজুয়েলাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, ৪. বিশ্বের শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির মাধ্যমে পৃথিবীকে বহুকেন্দ্রিক বহুত্ববাদী করে তোলা এবং ৫. ধরিত্রীর সব প্রাণ ও মানুষ প্রজাতিকে রক্ষা করা।'

জাদুর পাল্টা কালো-জাদুও আছে। প্রতিপক্ষ কাপ্রিলেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জিতলে তিনি চীন-রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বদলাবেন। তেলক্ষেত্রগুলোর মালিকানা ও ইজারায় আমূল পরিবর্তন আনবেন। এই কাপ্রিলেসকেই ২০০২ সালে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত ব্যর্থ ক্যুয়ের নেতা হতে।

দেশের ধনীদের প্রতিনিধি এই ব্যক্তির বিদ্রোহকে ধনীদের পরিচালিত টেলিভিশন মিডিয়া 'গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন' বলে প্রচার করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রও তড়িঘড়ি করে লজ্জার মাথা খেয়ে অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন দেয়। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় বিধি বামের দিকেই হেলে আছে।

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 6

ফেলানীর ভাস্কর্য

-প্রথম পাতার পর

ফেলানীর বাবা নাগেশ্বরী উপজেলার দক্ষিণ রামখানা ইউনিয়নের বানার ভিটা গ্রামের নুরুল ইসলাম নূরু। তিনি ১০ বছর ধরে দিল্লিতে কাজ করতেন। তার সঙ্গে সেখানেই থাকতো ফেলানী। দেশে বিয়ে ঠিক হওয়ায় বাবার সঙ্গে ফেরার পথে সীমান্ত পার হওয়ার সময় কাঁটাতারের বেড়ায় কাপড় আটকে যায় ফেলানীর। এতে ভয়ে সে চিৎকার দিলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং পরে লাশ নিয়ে যায়। কাঁটাতারের বেড়ায় ফেলানীর ঝুলন্ত লাশের ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সরকার ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির পক্ষ থেকেও বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে ফেলানী হত্যার বিচারের জন্য চাপ দেয়া হয়। বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১২ সালের মার্চে নয়াদিল্লীতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকে ফেলানী হত্যার বিচার দ্রুত শুরু করা হবে বলে আশ্বাস দেন বিএসএফের মহাপরিচালক। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএফ সদর দপ্তর 'জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্স কোর্ট' গঠন করে এবং আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বাংলাদেশের দুইজন সাক্ষী, একজন আইনজীবী এবং বিজিবির একজন প্রতিনিধিকে ভারতে যেতে বলা হয়।

গত ১০ বছর ধরে ফেলানী বিষয়টি জাগ্রত রাখার জন্য একটি ইন্টারনেট আন্দোলন চলে। আন্দোলনের স্লোগান ছিল: "ফেলানী নয়, নাম তার ফেলানী" এবং "ফেলানি নয়, ঝুলছে বাংলাদেশ।"

ফেলানীর বাবা মো. নুরুল ইসলাম ও মামা মো. আব্দুল হানিফ ভারতে গিয়ে ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন।

হ্যানসেন হাশিম ক্লার্ক

-প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য নির্বাচিত হন। কাছাকাছি সময়ে কুইল এবং ড্যাগার সোসাইটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি 'আলফা ফি আলফা' নামের একটি সংগঠনেও যোগ দেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিও পেয়ে যান। এরপর ভর্তি হন জর্জটাউন ল' স্কুলে। ১৯৮৭ সালে এ স্কুল থেকে জুরিস অব ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনীতিতে তাঁর সরাসরি অভিষেক ১৯৯০ সালে। মিশিগান হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ নির্বাচিত হন ওই বছর। এরপর বিভিন্ন মেয়াদে দাপটের সঙ্গে মিশিগান রাজ্যের রাজনীতিতে বিচরণ করেন প্রায় দুই দশক ধরে। জায়গা করে নেন ডেমোক্রেটিক পার্টিতে। পার্টিতে তাঁর প্রভাব কম নয়। এ সময় তিনি মিশিগান আইন কমিশনের সদস্য ও মিশিগান লেজিসলেটিভ ব্ল্যাক ককাসের কোষাধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করবেন। ২০০৪ সালে বিয়ে করেন চই প্লাম-কোহনকে।

১৯৯০, ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে তিনবার মিশিগানের প্রতিনিধি এবং ২০০২ ও ২০০৬ সালে রাজ্যের সিনেটর নির্বাচিত হন। ২০১০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করেন হ্যানসেন। নির্বাচনে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে লড়েন। ভোট পান এক লাখ ৮৮৫টি। মোট ভোটের ৭৯.৪ শতাংশই ছিল তাঁর।

হ্যানসেন হাশিম বাংলা বলতে পারেন না। তবু পিতৃভূমির প্রতি টান রয়েছে তাঁর। ২০০৭ সালে বাংলাদেশে এলেন; তখন যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তাতে ভীষণ মুগ্ধ তিনি এবং অনেকটা গর্বিতও। তাঁর বাবার দেশের মানুষ এত আপন করে কাছে টানতে পারে! যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ-আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি অনাবাসী (এনআরবি) সম্মেলনের কারণে ওই একবারই এসেছিলেন এ দেশে। ২৭ ডিসেম্বর সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর গিয়েছিলেন বাপের বাড়ি। বাবা মোজাফফর হাশিমের ছোটবেলা কেটেছে যে গ্রামে, সেই সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌর শহরের উত্তর শ্রীধরা গ্রামটাকে দেখে যান নিজের চোখে।

সিনেটর থাকা অবস্থায় তিনি জড়িত ছিলেন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটিতে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা, সীমান্ত ও নৌ-নিরাপত্তা, মহাকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে। গুরুত্ব দিয়েছেন জনগণের স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন, বিনিয়োগ ও কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি, স্থানীয় সরকারের ওপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতিও।

ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হ্যানসেন জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তিনি কাজ করতে চান। বাড়াতে চান ব্যবসা-বাণিজ্য।

তাঁর ইচ্ছাটা এখন সময়ের হাতে।

আদিবাসী ছাত্র

-প্রথম পাতার পর

পূর্বসূরীরা বর্তমান বিহার-নেপাল সীমান্তের কাছে বাস করত। তারা আদিতে একটি তিব্বতি-বর্মী ভাষায় কথা বলত। কিন্তু কালের পরিসরে প্রতিবেশী চাটগাঁইয়া ভাষা চাকমা ভাষার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। চাকমা ভাষা নিজস্ব চাকমা লিপিতে লেখা হয়।

প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাইনো তিব্বতী মঙ্গোলয়ড ১৪ টি জাতিগোষ্ঠী এখানে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। প্রায় ৫,০০,০০ (পাঁচ লক্ষ) জনসংখ্যার অভিবাসী উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীর প্রধান দু'টি হলো চাকমা এবং মারমা। এরা ছাড়াও আছে ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখো, ম্রো, খিয়াং, বম,খুমি, চাক,গুর্খা, আসাম,সানতাল, এবং পার্বত্য বাঙ্গালী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম (পার্বত্যবঙ্গ) অঞ্চলটি ১৫৫০ সালের দিকে প্রণীত বাংলার প্রথম মানচিত্রে বিদ্যমান ছিল। তবে এর প্রায় ৬০০ বছর আগে ৯৫৩ সালে আরাকানের রাজা এই অঞ্চল অধিকার করেন। ১২৪০ সালের দিকে ত্রিপুরার রাজা এই এলাকা দখল করেন। ১৫৭৫ সালে আরাকানের রাজা এই এলাকা পুনর্দখল করেন, এবং ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত অধিকারে রাখেন। মুঘল সাম্রাজ্য ১৬৬৬ হতে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এলাকাটি সুবা বাংলার অধীনে শাসন করে। ১৭৬০ সালে ব্রিটিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই এলাকা নিজেদের আয়ত্বে আনে।

১৮৬০ সালে এটি বৃটিশ ভারতের অংশ হিসাবে যুক্ত হয়। ব্রিটিশরা এই এলাকার নাম দেয় চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস বা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটি চট্টগ্রাম জেলার অংশ হিসাবে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে এই এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি বাংলাদেশের জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলা - রাঙামাটি, বান্দরবন, ও খাগড়াছড়িতে বিভক্ত করা হয়।

১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তাবায়ন হয় ২০২০ সালে। বাস্তবায়নের বছর নতুন কিছু বিষয় আনা হয়, যার মধ্যে নিজ ভাষায় পরীক্ষা দেবার দাবি ছিল প্রথম সারিতে।

দোয়েলের বিশ্বজয়

-শেষ পাতার পর

এদিকে দোয়েল এর দোয়েল ল্যাপটপ এবং প্যাড এর প্রধান ডিজাইনার স্টিভ চাকলাদার জানিয়েছেন, দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব এর ভার্সন ৪.১ বাজারে আসবে আগামী দুই মাসের মধ্যেই। এরই ভার্সনে ১৬ কোর প্রসেসর এবং ৮ গিগাবাইট বিল্ট ইন র‍্যাম থাকবে বলে জানিয়েছেন স্টিভ চাকলাদার। এই ঘোষণায় প্রযুক্তি বাজারে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ট্যাব এবং লাপটপে এই প্রথম ১৬ কোর প্রসেসর স্থাপন করবে কোন প্রতিষ্ঠান। স্টিভ চাকলাদার আরো জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ দেশী প্রযুক্তিতে কোয়ান্টাম কম্পুটিং ব্যবহার করে এই ১৬ কোর প্রসেসর নির্মান করা হবে যা গতানুগতিক প্রসেসর থেকে বিদ্যুত সাশ্রয়ী এবং হালকা।

এই প্রসেসসর টি আবিষ্কার করেছে বুয়েট এর কম্পুটার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা। এই ১৬ কোর প্রসেসসর সংযুক্ত দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব মার্কেট এর একটা বড় অংশ দখল করবে বলে ধারণা করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

উক্ত ঘোষণার পরে বাজার হারানোর আশঙ্কায় সামসুং এবং এপল কোম্পানির শেয়ারের মূল্য ২% এবং ৩% পরে যায়. এবং টেলিফোন শিল্প সংস্থার শেয়ার এর মূল্য ৮.২% বৃদ্ধি পায়।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীকে দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব এর সাফল্যের চাবিকাঠি জানতে চাইলে, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, টেলিফোন শিল্প সংস্থার গবেষকেরাই দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব এর সাফল্যের প্রধান নিয়ামক. সরকার শুধু মাত্র তাদের সহযোগিতা করেছে মাত্র।

দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব সোনালী আশ এবং পোশাক শিল্পের পরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে দাড়াবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দোয়েল ল্যাপটপ এবং ট্যাব বিশ্বের বুকে বাংলাদেশী প্রযুক্তির আগমনী গান শোনাবে।

বাংলা অভিধানে

-শেষ পাতার পর

শব্দমালার উপর। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে রচিত এই অভিধান এবলা (বর্তমান সিরিয়া) এলাকাতে সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় ২য় শতকের সময়ে ব্যবলীয়ন অভিধান উর্রা-হুবুলু সুমেরীয় ভাষার আরেকটি পুরাতন অভিধান।

বাংলা ভাষার অবিধানের এত বড় পরিবর্তন বহু বছর হয় নাই। তবে কেউ কেউ দাবি করছেন এতে বাঙলা ভাষার প্রচুর লোকসান হবে। রবী বাবু বেচে থাকলে কি ভাবতেন, এই নিয়ে সচেতন মহলের চিন্তা। তবে ব্যাপার হল, উনি তো আসলেও বেচে নেই।

২০০০ মেগাওয়াট

- ২য় পাতার পর

প্রদান করতেও সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ। সাপ্লয়ার্স ক্রেডিটে বাংলাদেশী উৎপাদকদের কাছ থেকে সরঞ্জামাদি কেনার সম্ভাব্য শর্ত নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে চুক্তিটি সাক্ষরে দেরী হচ্ছে বলে জানা যায়।

তবুও এই সকল ছোট খাট বিষয়ের সমাধান করে, শীঘ্রই চুক্তিটা সাক্ষর হবে বলে জানিয়ছেন উভয় দেশের কর্মকর্তারা।

আশা করা যাচ্ছে, আগামী তিন মাসের মধ্যেই এই অবকাঠামো নির্মান করে ভারত বাংলাদেশ থেকে ২০০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুত আমদানি করতে সক্ষম হবে।

এই বিদ্যুত রপ্তানির সুবাদে ভারতের মধ্যে বাংলাদেশী বিরোধী মনোভাব কমবে বলে জানিয়েছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

ফিলিস্তিন জাতিসংঘের

-প্রথম পাতার পর

ফিলিস্তিন ভূখন্ডটি জায়োনিষ্টদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয় বৃটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর বৃটেন স্বাধীনতা দেয়ার অঙ্গীকারে ১৯১৮ সাল থেকে ৩০ বছর দেশটিকে নিজেদের অধীন রাখে। মূলত এই সময়টিই ফিলিস্তিনকে আরব শূন্য করার জন্য ভালোভাবে কাজে লাগায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি।

টানা আন্দোলনের পর আমেরিকার মত পরিবর্তনের কারণে এই বর্তমান পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। ইসরায়েল-এর ভেতরেও নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসেছে যারা জোরালো ভাবে বলেছে যে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাদেশ থেকে ডাক টিকিট প্রকাশের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

লালন শাহের মাজার

-১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ পেয়েছে। লালনের বেশ কিছু রচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে অতীব সংবেদনশীল ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যখন হিন্দু ও মুসলিম মধ্যে জাতিগত বিভেদ-সংঘাত বাড়ছিল তখন লালন ছিলেন এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

লালনের এই ইতিহাস গবেষকরা ক্রমাগত পুরো পৃথিবীকে জানাচ্ছে। লালনের গান এখন প্রায় ১৮টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। লালনের অবদান সঠিক ভাবে স্মরণ করার জন্য অতি-বানিজ্যিকরনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমরা সবাই আসা করি লালন যেন চে গুয়েভারা'র মতই অত্যধিক টি-শার্ট'এর সংস্কৃতির মধ্যে হারিয়ে না যায়।

ক্যাফে ম্যাংগো

-১৩ পৃষ্ঠার পর

দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রো ব্যবস্থা হল লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ও সাংহাই মেট্রো। দৈনন্দিন যাত্রী পরিবহণ সংখ্যা অনুযায়ী, বিশ্বের ব্যস্ততম মেট্রো ব্যবস্থাটি হল টোকিও মেট্রো ও মস্কো মেট্রো। বাংলাদেশ দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পৃথিবির ৩০তম, কিন্তু যাত্রী সংখ্যার দিক থেকে ৯ম।

বাংলাদেশে প্রায় ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নদী জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই (৯৪%) নৌকা ও লঞ্চে এবং বাকিরা (৬%) স্টীমারে যাতায়াত করেন। এখন পাতাল ট্রেন হবার কারণে যাতায়তের জন্য নদীর ব্যাবহার ৬০% কমে গেছে। এতে জলবায়ু দূষণ অনেকটা কমেছে।

ক্যাফে কার যুক্ত করার ব্যাপারে যাত্রীরা খুবই উৎসাহী। জানা গেছে লম্বা যাত্রাপথে ঠিকমত খাবার ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের বেশ দুর্ভোগ হয়। পাতাল ট্রেনে পুরনো দিনের ট্রেনের মত জানলার ফাঁক দিয়ে চানাচুর, ডাবের পানি, বিস্কুট, চিপস, চা , ইত্যাদি চালান দেওয়া সম্ভব নয় । টিকেট ছাড়া ট্রেনে চড়ার ব্যাপারেও কড়াকড়ি অনেক। তাই অধিকাংশ যাত্রী খাবার সাথে করে আনে। ক্যাফে কার যুক্ত করার কারণে এই ঝামেলা অনেকটা কমে যাবে

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 7

কলকাতায় বাংলা ভাষার প্রচলন কমে আসছে

সাম্প্রতিককালে কলকাতায় বাংলা ভাষার প্রচলন আশঙ্কাজনকভাবে কমে আসছে। বইপাড়ায় হিসাব নিতে গিয়ে জানা গেছে গত ছয় মাসে মোট বিক্রির প্রায় ৮০% ইংরেজি বই। বাংলা বইয়ের মধ্যে চাকরী, স্বাস্থ্য, রূপচর্চা বিষয়ক বইয়ের কাটতি বেশি। সাহিত্য বই প্রায় বিক্রিই হয় না। এই বিষয়ে আক্ষেপ করে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এক লেখক জানিয়েছেন, "বাংলাদেশের বাজার আছে বলেই আমরা এখনও টিকে আছি। নাহলে আমাদের লেখা আর আজকাল কেউ পরে না। সবাই চেতন ভাগাত নিয়ে ব্যস্ত। কল সেনটার কাহিনী আবার সাহিত্যর উপাদান কবে থেকে? যত্তসব হাবিজাবি ইংরেজি চর্চা!"

কলকাতা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বৃহত্তম শহর। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। এই জনসংখ্যার বিচারে কলকাতা ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম মেট্রোপলিটান বা মহানগরীয় অঞ্চল এবং বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল। কলকাতা পৌরএলাকার উত্তর দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা অবস্থিত। পশ্চিম দিকে হুগলি নদী এই শহরকে হাওড়া জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ শহর থেকে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা শুধুমাত্র বাংলারই নয়, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কলকাতা নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ঘোষিত হয়। এই সময় কলকাতা ছিল আধুনিক ভারতের শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক পীঠস্থান। ১৯৫৪ সালের পর থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে সেই গৌরব অনেকাংশে খর্ব হয়। তবে ২০০০ সালের পর থেকে এই শহর পুনরায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং সাংস্কৃতিক হৃতগৌরব অনেকাংশেই পুনরুদ্ধার করে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে বামপন্থী গণ আন্দোলনগুলিতে এই শহর এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে আধুনিক ভারতের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলিরও প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা। এই কারণে এই শহরকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী নামে অভিহিত করা হয়। আবার কলকাতা শহরে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষদের শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময় সহাবস্থানের জন্য এই শহরকে আনন্দ নগরী বা সিটি অফ জয় নামেও অভিহিত করা হয়। রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রোনাল্ড রস, সুভাষচন্দ্র বসু, মাদার তেরেসা, সত্যজিৎ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রামন, অমর্ত্য সেন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের কর্মভূমি কলকাতা মহানগরী তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য আজও বিশ্ববাসীর চোখে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

১৮৫০-এর দশক থেকে কলকাতা শহর বস্ত্রবয়ন ও পাটশিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করতে শুরু করে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে শহুরে বাঙালিদের মধ্যে এক নব্য বাবু শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এই বাবুরা ছিলেন সাধারণত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সংবাদপত্রের পাঠক। পেশাগতভাবে এঁরা ছিলেন জমিদার, সরকারি কর্মচারী বা শিক্ষক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ নামে পরিচিত যে যুগান্তকারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন বাঙালি সমাজের চিন্তাধারা ও রুচির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল তার পটভূমিও ছিল এই কলকাতা শহর। বাংলার নবজাগরণ শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক হয়েছিল। এই আন্দোলনের পুরোধাপুরুষেরা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বাঙালিরা কলকাতার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী; মারোয়াড়ী ও বিহারি সম্প্রদায় শহরের উলেখযোগ্য জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এছাড়াও কলকাতা প্রবাসী চীনা, তামিল, নেপালি, ওড়িয়া, তেলুগু, অহমীয়া, গুজরাটি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আর্মেনিয়ান, তিব্বতি, মহারাষ্ট্রীয়, পাঞ্জাবি, পারসি প্রভৃতি জাতিগত সম্প্রদায়ের বাসভূমি। কলকাতার প্রধান ভাষা হল বাংলা ও ইংরেজি; এছাড়াও হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ও ভোজপুরি ভাষাও শহরের একাংশের বাসিন্দাদের দ্বারা কথিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে কলকাতায় বাংলার প্রচলন কমে যাবার একটা বড় কারণ হচ্ছে টিভি সিরিয়াল, বিশেষ করে ডিজিটাল পর্দায় হিন্দি ভাষার আগ্রাসন। আজকাল প্রায় সব জনপ্রিয় সিরিয়াল ইংরেজি বা হিন্দি তে হয়ে থাকে। অন্য দেশের অনুষ্ঠানও হিন্দিতে ডাব করা হয়। যার ফলে একটা নতুন জেনারেশান বড় হচ্ছে যাদের জন্য বাংলা এখন তৃতীয় ভাষা, এবং স্বাভাবিক ভাবেই এর উপর তাদের দখল দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এর পরিণতি দেখা যাচ্ছে বাংলা বইয়ের কাটতি হ্রাসের মাধ্যমে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার এক সম্পাদক জানিয়েছেন, "এক সময় সুনীল-দা এসব ব্যাপারে খুব সোচ্চার ছিলেন। উনি সবসময় বলতেন, বাংলাদেশের দিকে তাকাও। ওখানে বাংলা চর্চা তবু চলছে, সাধু-চলতি স্ল্যাং মিলিয়ে হলেও চলছে। সুনীল বাবু চলে যাবার পরে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করার মানুষ আর নাই।"

কলকাতায় চলতি একটা গল্প আছে যে অপর্ণা সেন প্রথম ঢাকায় যাবার পরে লিখেছিলেন যে বাংলা ভাষায় গাড়ীর লাইসেন্স প্লেট দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। গল্পটি যাচাই করার সুযোগ হয় নাই, তবে এটা নিশ্চিত যে বাংলাদেশে ভাষা চর্চার মাত্রা দেখে কলকাতার বিদ্যান'রা বোঝেন যে বাংলা ভাষার কেন্দ্রবিন্দু এখন আর কলকাতা নয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে নাগরিকত্বের নতুন নিয়ম

সংযুক্ত আরব আমিরাত সংসদ নতুন নাগরিকত্ব আইন আলোচনা করছে। প্রস্তাবিত আইনে কেউ যদি ১০ বছর এই দেশে কাজ করে, তবে তার নাকরিকত্ব পাবার অধিকার থাকবে। বর্তমান আইনে শুধুমাত্র ২০ বছর থাকার পরে নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। সময়সীমা ২০ বছর থেকে ১০ বছরে নামিয়ে আনার কারণে বলা হয়েছে এই আইন পাশ হলে প্রায় আধা কোটি ভারতীয়, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, নেপালি, শ্রী লঙ্কান ইত্যাদি দেশের মানুষ সংযুক্ত আরব আমিরাত পাসপোর্ট পাবে। আর ঠিক সেই কারণেই এই আইনের ব্যাপারে তুমুল আন্দোলন করছে এমিরাতিরা। তাদের আন্দোলনের ব্যানার হচ্ছে "এমিরাত এমিরাতিদের জন্য"। তবে দুবাই সরকারের ইচ্ছার কারণে এই আইনের ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অনেকের ধারনা এবার আইনটা পাশ হয়ে যাবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় অবস্থিত সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি ফেডারেশন। ১৯৭১ সালে দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাতটি আমিরাতের নাম হল আবু ধাবি, আজমান, দুবাই, আল ফুজাইরাহ, রাস আল খাইমাহ, আশ শারিকাহ এবং উম্ম আল ক্বাইওয়াইন। আবু ধাবি শহর ফেডারেশনের রাজধানী এবং দুবাই দেশের বৃহত্তম শহর।

সংযুক্ত আরব আমিরাত মরুময় দেশ। এর উত্তরে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সৌদি আরব, এবং পূর্বে ওমান ও ওমান উপসাগর। ১৯৫০-এর দশকে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত মূলত ব্রিটিশ সরকারের অধীন কতগুলি অনুন্নত এলাকার সমষ্টি ছিল। খনিজ তেল শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এগুলির দ্রুত উন্নতি ও আধুনিকায়ন ঘটে, ফলে ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে আমিরাতগুলি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। দেশের খনিক তেলের বেশির ভাগ আবু ধাবিতে পাওয়া যায়, ফলে এটি সাতটি আমিরাতের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী। তেল শিল্পের কারণে এখানকার অর্থনীতি স্থিতিশীল এবং জীবনযাত্রার মান বিশ্বের সর্বোচ্চগুলির একটি।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম মানব বসতির সন্ধান পাওয়া যায় খৃষ্ট পূর্ব ৫৫০০ শতাব্দী থেকে। তৎকালে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বলতে উত্তর- পশ্চিমের মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সাথে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজর পর্বতে প্রাপ্ত তামা দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে মেসোপটেমিয়ার সাথে এই যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তৃত হয়। ১ম শতাব্দী থেকে ভূমি পথে সিরিয়া ও ইরানের দক্ষিণাংশের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়। পরবর্তীতে ওমানা বন্দর(বর্তমান ওম্ম-আল-কোয়াইন) এর মাধ্যমে সমুদ্র পথে ভারতের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত যেহেতু ব্যাবসার খাতিরে বহু বছর অভিবাসী উৎসাহিত করে, জনসংখ্যায় এর চাপ বোধ করা যাচ্ছে। মোট জনসংখ্যার ৯১% মানুষ অন্য দেশ থেকে আসা, আর মাত্র ৯% মূল এমিরাতি। ভারতীয় মানুষ আছে সরকারি হিসাবে ২৫ লাখ, বেসরকারি হিসাবে ৩০ লাখ। বাংলাদেশি আছে সরকারি হিসাবে ১২ লাখ, বেসরকারি হিসাবে ২০ লাখ। বিভিন্ন অভিবাসী সংস্থা এখন এমিরাতি সরকারের উপর ছাপ দিচ্ছে দ্রুত আইনটি পাস করাবার জন্য।

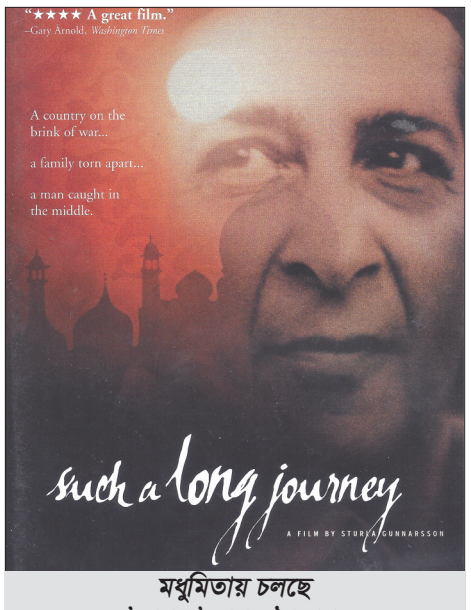

মধুমিতায় চলছে
৬:০০, ৮:০০, ১০:০০

First Section Fn_Layout 1 22/01/14 10:14 AM Page 8

রবি শঙ্কর স্মরণে নড়াইলে নতুন সড়ক

রবি শঙ্করের ১৯৭১ সালে "কন্সার্ট ফর বাংলাদেশ" স্মরণে নড়াইলে নতুন সড়ক উদ্বোধন করা হচ্ছে। পন্ডিত শঙ্করের দুই মেয়ে, অনুশকা শঙ্কর ও নোরা জোন্স, সড়ক উদ্বোধন করতে আসবেন। নোরা জোন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জ্যাজ্ সঙ্গীত শিল্পী। তিনি রবি শংকরের কন্যা। তাঁর মা সু জোন্স একজন নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ২০০২ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রথম পপ সঙ্গীত অ্যালবাম "কাম আওয়ে উইথ মি" এর মাধ্যমে তিনি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন। সারা বিশ্বে এর ২ কোটি কপি বিক্রি হয়। এই অ্যালবামের জন্য তিনি ৮টি গ্র্যামি এওয়ার্ড পান।

ওদিকে বোন অনুশকা শংকর একজন সেতার বাদক এবং মিউজিক কম্পোজার। তিনি রবি শংকর এবং সুকণ্যা কৈতান এর কণ্যা। নয় বছর বয়স থেকে অনুশকা তাঁর বাবার কাছে সেতারের দীক্ষা নিতে শুরু করেন। অনুশকা শংকর তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার জন্য ১৯৯৮ সালে বৃটেনের হাউজ অব কমন্স শীল্ড লাভ করেন। তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে এই সম্মান লাভ করেন । ২০০৪ সালে টাইম ম্যাগাজিন এশিয়া এডিশন কর্তৃক এশিয়ার ২০ জন সেরা হিরোর একজন হিসেবে তাকে নির্বাচিত করে।

১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল, তখন জর্জ হ্যারিসন তার বন্ধু রবি শংকর এর পরামর্শে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে দুটি দাতব্য সঙ্গীতানুষ্ঠান (কনসার্ট) এর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটিতে জর্জ হ্যারিসন, রবি শংকর ছাড়াও গান পরিবেশন করেন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, রিঙ্গো স্টার সহ আরও অনেকে। কনসার্টে জর্জ হ্যারিসন তার নিজের লেখা "বাংলাদেশ" গান পরিবেশন করেন। কনসার্টের টিকেট, সিডি ও ভিডিও হতে প্রাপ্ত অর্থ ইউনিসেফের ফান্ডে জমা করা হয়।

পন্ডিত রবি শংকরই মূলতঃ এই অনুষ্ঠানের জন্য জর্জ হ্যারিসনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। জর্জ হ্যারিসনের ১৯৭৪ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুষ্ঠানমালায় পন্ডিত রবি শংকর ও তাঁর সঙ্গীরা উদ্বোধনী অংকে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

পন্ডিত রবি শংকরের অমর কীর্তি হচ্ছে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীতের মিলন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহিনের সঙ্গে সেতার-বেহালার কম্পোজিশন তাঁর এক অমর সৃষ্টি যা তাঁকে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের এক উচ্চ আসনে বসিয়েছে।

১৯৯০ সালে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ফিলিপ গ্লাসের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা "প্যাসেজেস" তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ২০০৪ সালে পন্ডিত রবি শংকর ফিলিপ গ্লাসের ওরিয়ন প্রযোজনার সেতার অংশের সঙ্গীত রচনা করেন।

সিরিয়ায় মার্কিন উপস্থিতির কারণে পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান

অনিকেত আলমগিরের সারা জাগানো ছবি "বিষাদ" গত এক বছর ভাল ব্যবসা করেছে। এবার নতুন বছরে অন্য ধরনের চমক লাগিয়েছে ছবিটি। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের মনোনয়ন পেয়ে ছবিটি "অ্যাপল আইটিউনস" পুরষ্কার অনুষ্ঠানের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেস যায়। শেষমেশ ছবিটি আন্তর্জাতিক ছবি ক্যাটেগরিতে "নতুন পরিচালক" হিসাবে পুরষ্কারও পায়। কিন্তু মঞ্চে উঠে অনিকেত পুরষ্কার নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ঢাকা, দুই শহরেই বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সাচিন লিটল ফেদার

সরাসরি সম্প্রচার করা এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসার পরে অনিকেত একটি লিখিত বক্তৃতা পরে শোনায়। তার ভাষ্য অনুযায়ী, "এই পুরষ্কার প্রাপ্তি যদিও আমার জন্য একটা বড় সম্মান, আমি তবু এটা নিতে পারছি না। আপনারা জানেন যে গত দশ বছর ধরে সিরিয়া'র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুধু বেড়ে চলেছে। আর এই যুদ্ধে মার্কিন উপস্থিতি পুরো যুদ্ধকে আরও ঘোলাটে করে দিয়েছে। এবং এই পরিস্থিতির সাথে নানা প্রযুক্তি কোম্পানি জড়িত, যার মধ্যে অ্যাপল আছে। আপনাদের আমেরিকান পত্রিকাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে অ্যাপল কন্সিউমার প্রযুক্তি ছাড়াও মিলিটারি খাতে প্রচুর খরচ করছে। তাই আমি এই পুরষ্কার নিতে অপারগতা জানাই।"

প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে, পুরষ্কার কমিটির চেয়ার লিওনার্দো ডি ক্যাপড়িও বলেন, "ব্যাপারটা বুঝতে পারি এবং আমার সহানুভূতি আছে। আমি এই যুদ্ধের পক্ষপাতী না, এবং গত জরিপে ৮৯% আমেরিকানই বলেছে তারা এই পরিস্থিতির অবসান চায়। সুতরাং উনার মন্তব্যটা আমি বুঝি। তবু বলি, উনি পুরষ্কারটা নিতে পারতেন। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ছবিটা খুবি পছন্দ করেছিলাম।"

ক্যাপড়িওর জবাব ঠান্ডা মেজাজের হলেও ঢাকার মেজাজ ছিল গরম। অনুষ্ঠানের পরে এক বিবৃতিতে চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি সাকধাক নেসা বলেন, "সব কিছুতে রাজনীতি টেনে আনা অনিকেতের পুরনো এবং নিন্দনীয় অভ্যাস। আমরা দেখেছি কম্যুনিস্ট পার্টি করা ছেলেমেয়ে দিয়ে পুরো ঢালিউদ ভরে গেছে। এরা সবাই চায় ছবির মাধ্যমে রাজনীতি করতে। কিন্তু, এভাবে হয় না। মানুষ ছবি দেখতে আসে পৃথিবী ভুলে যেতে, সজাগ হবার জন্য সংবাদপত্র আছেই। মোট কথা, আমাদের মনোনয়নটা নষ্ট হল।"

জানা গেছে যে যদিও অ্যাপল পুরষ্কারের সাথে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়, ছায়াছবির ভবিষ্যৎ কিন্তু এই পুরষ্কার দিয়ে অতটা পরিবর্তন হয় না। ইদানিং মোবাইল ফোনে ছায়াছবি দেখার রেওয়াজ উঠে গেছে। কন্টাক্ট লেন্সের মাধ্যমে চোখের মনির ভেতরেই ছায়াছবি দেখা যায়। তাই অ্যাপল-এর সেই আগের মত মর্যাদা নাই বললেই চলে।

রাজনৈতিক কারণে পুরষ্কার প্রথ্যাখ্যান অবশ্য বহুবার হয়েছে। ছয়জন বিজয়ী নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন। জ্যাঁ পল সাঁত্রে ১৯৬৪ সালে সাহিত্যে নোবেল নিতে অস্বীকৃতি জানান। ভিয়েতনামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি ডাক থো ১৯৭৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কি-সিঞ্জারের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিতে পুরস্কার নিতেও অস্বীকৃতি জানান।

ওদিকে অস্কার পুরস্কার পাবার পরে মারলন ব্রানডো নিজে না এসে তার বন্ধু সাচিন লিটলফেদার-কে পাঠান। অনেকটা অনিকেতের অনুরূপ সাচিন একটা লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনায়। সেই বক্তব্যের মাধ্যমে মারলন ব্র্যান্ডো জানায় যে আমেরিকার মুল আদিবাসী নেটিভ আমেরিকানদের উপর অত্যাচারের কারণে তিনি এই পুরস্কার প্রথ্যাখ্যান করছেন।

ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৩ সালের পুরস্কার অনুষ্ঠানের সময়, যেখানে ব্র্যান্ডো "গডফাদার" ছবির জন্য সেরা অভিনেতা পুরস্কার পায়। সেই সময় "উনডেড নি" নামের এলাকায় এফবিআই-এর গোয়েন্দারা নেটিভ আমেরিকান সংগ্রামীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেই ঘটনার জের ধরেই ব্র্যান্ডোর এই পুরস্কার প্রথ্যাখ্যান।

সেই ১৯৭৩ সালেও বলা হয়েছিল, "এখানে রাজনীতি কেন?" আজ সেই একই কথা অনিকেত আলমগিরকেও শুনতে হচ্ছে।